স্মৃতিময় ৭১ : যে ভাবে মওলানা মান্নান হত্যা করলো আলীম চৌধুরীকে

শ্যামলী চৌধুরী

ডাঃ আলীম চৌধুরী

[শ্যামলী আপার সাথে আমার একটা আত্মীক সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটা শ্রদ্ধার, সেই সাথে ভালোবাসার। শ্যামলী আপা ছিলেন আমাদের প্রধান শিক্ষিকা, যে সময়টা আমি উদয়ন স্কুলে আমার শৈশব আর কৈশোরের মজার দিনুগলো পার করেছিলাম।-- অভিজিৎ]

একাত্তরের কিছু আগে আজিমপুরের বাসা থেকে আমরা পুরানা পল্টনের নতুন বাসায় চলে এলাম। বাসাটি ছিল তিনতলা। আলীম সেটি ভাড়া নিয়েছিল নিচের তলায় চোখের ক্লিনিক করবে বলে। কিছুদিনের মধ্যেই ক্লিনিক হয়ে গেলো।

এক তলায় ক্লিনিক, দোতলা ও তিনতলায় আমরা থাকতাম। আরম্ভ হলো সংগ্রাম। ২৫ মার্চের রাতেই বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজর"ল ইসলাম আমাদের বাসায় এলেন। তিনি ছিলেন আমার ননদের বাসায়। তাকে লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব পড়লো আমাদের ওপর। কয়েকদিন তাকে তিনতলার একটি ছোট ঘরে রেখে ২৯ মার্চ শাড়ি পরিয়ে আমরা সরিয়ে দিলাম। আমার ছোট ভাই স্বপন বোরকা পরিহিত সৈয়দ নজর"ল ইসলাম সাহেবকে মরহুম আহমেদ ভাইয়ের বাসায় দিয়ে এলো। সেখানে থেকেই তাকে ঢাকার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একাত্তরের জুলাই মাসের মাঝামাঝি **মওলানা আবদুল মান্নান** আমাদের নিচের তলায় এসে আশ্রয় নিলেন। একদিন সকাল ১০টার দিকে টিপটিপ বৃষ্টি হ"ছিল। হঠাৎ দোতলা থেকে দেখি আমাদের প্রতিবেশী তৎকালীন পিডিবির মতীন সাহেব একজন লোক নিয়ে আমার স্বামীর কাছে এলেন। মতীন সাহেব তাকে বললেন, ভদ্রলোক পরিবার নিয়ে অত্যন্ত বিপদে পড়েছেন। তার ঘরবাড়ি কে বা কারা জ্বালিয়ে দিয়েছে। তিনি একেবারেই নিরাশ্রয়। এই মুহূর্তে তাকে আশ্রয় না দিলে ভদ্রলোকের খুবই অসুবিধা হবে। সব শুনে আলীম ওপরে উঠে এলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলো। আমি শুনেই এক কথায় না করে দিলাম। সেও নিচে গিয়ে তাদের মানা করে দিলো কিন্' মওলানা

মান্নান এবং মতীন সাহেবের অনুনয়-বিনয় শুনে আবার আলীম ওপরে উঠে এলো। আমাকে সে বোঝাতে চেষ্টা করলো কিন্' আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। সে তখন আমার শাশুড়িকে অনুরোধ করলো আমাকে রাজি করানোর জন্য। অগত্যা আমি চুপ করে গেলাম। কিন্' আমি আর আমার মা সেদিন ঐ লোকটিকে আশ্রয় দিতে হলো বলে রাগে-দুঃখে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম। মওলানা মান্নান এক কাপড়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে উঠে এলেন আমাদের বাসার এক তলায়। চক্ষু ক্লিনিকের রোগীর বিছানা চাঁদর ইত্যাদি পাল্টে তাদের কথাতে দিলাম। ক্লিনিক বন্ধ হয়ে গেলো। চেম্বারটি দোতলায় আমাদের ড্রয়িংর"মে স্থানান্তর করা হলো। প্রায় ৪/৫ দিন চা, নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করলাম। ৭/৮ দিনের মাথায় দেখা গেলো– মওলানার বাড়ি জিনিসে ভরে গেছে। পাকিস্তানি সৈন্যরা সব সময়ই তার ওখানে আসতো। প্রায়ই রাতভর হৈহুলোড় চলতো সে বাড়িতে। কয়েকদিন পর দেখা গেলো দুজন আলবদর আমাদের দিকের গেটে পাহারারত আর ৪/৫ জন মওলানার গেটে। তখনো বুঝিনি যে এরা আসলে আমাকে পাহারা দেয়। ভেবেছিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে মওলানা এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েও কোনো লাভ হলো না। একদিন মওলানার কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি চিঠি এলো– আলীম ভাই ওপরে না থাকলে তোমাকে কবেই আমরা বোমা মেরে উড়িয়ে দিতাম। সেদিন থেকে আমাদের দিকের পাহারা আরো জোরদার করা হলো। মনে যাই থাক মুখে মওলানা খুবই ভালো ব্যবহার দেখাতেন আমার স্বামীর সঙ্গে। তিনি সব সময়ই বলতেন– ডাক্তার সাহেব, আপনার উপকার আমি জীবনে ভুলবো না। আপনার কোনো ভয় নেই। আপনার কোনো বিপদ হবে না। যদি কখনো কোনো অসুবিধায় পড়েন, সোজা আমার কাছে চলে আসবেন। আমি আপনাকে রক্ষা করবো। আমার জীবন থাকতে আপনার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

আমার স্বামী এই আশ্বাসবাণীতে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন। প্রতিদিন চেম্বারে মুক্তিযোদ্ধারা আসতো। এখানে তাদের বিনামুল্যে চোখের চিকিৎসা হতো, ওষুধ দেওয়া হতো। আবার গাড়ি করে তাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হতো। আলীম নিহত হওয়ার পরও মুক্তিযোদ্ধারা এসে আমাকে বলেছে, এই দেখুন আমার চোখে এখনো আলীম ভাইয়ের দেওয়া ব্যান্ডেজ। এ সম্পর্কে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আ"ছা বলুনতো মিসেস চৌধুরী, আপনাদের নিচের তলায় আলবদর আর ওপরের তলায় মুক্তিযোদ্ধারা আসে, এ আপনাদের কোন ধরনের ব্যবস্থা ছিল? আমি সেদিন কোনো উত্তর দিতে পারিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গোপন হাসপাতাল ছিল। সেখানে ডা. রাব্বি, আলীম এবং অনেক ডাক্তার গিয়ে চিকিৎসা করতেন। আলীম তার গাড়ির বনেট ভরে বিভিন্ন ওষুধের কোম্পানিতে ঘুরে ঘুরে ওষুধ সংগ্রহ করতো এবং তা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরবরাহ করতো। সে চাঁদাও তুলেছে বহু টাকা অনেকের কাছ থেকে। দুর থেকে আলীমের গাড়ি দেখলে অনেকেই বাড়িতে নেই বোঝানোর জন্য দরজা বন্ধ করে দিতেন

যাতে সে ফিরে যায়। তারা ভয় পেতেন এই ভেবে যে, আলীমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে পাছে বিপদে পড়তে হয়। বিপদে পড়া অনেক বাঙালি পরিবারকে আশ্রয় এবং সাহায্য দিতে সব সময়ই আলীম ব্যস্ত থাকতো। এ সব কিছুই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জানা ছিল বোধহয়, কিন্' আমরা তা বুঝতে পারিনি। বুঝেছিলাম যখন তখন আর শেষ রক্ষা হলো না। একাত্তরের ১৫ ডিসেম্বর সেদিন। সকাল ৮টায় আলীম তৈরি হ'ছিল সলিমুলাহ মেডিকেল কলেজে যাওয়ার জন্য। তখন সে সেখানে কর্মরত ছিল। মাস দেড়েক আগে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে বদলি করে তাকে সলিমুলাহ মেডিকেল কলেজে নিয়োগ করা হয়েছিল। সে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বললাম– এই তো বেরিয়ে যা'ছ, আসবেতো সেই কারফিউ আরম্ভ হয়ে গেলে। বুঝতে পারছি আজো আমাদের বাসা থেকে সরে যাওয়া হবে না। আলীম বললো, না ঠিকই সময়মতো চলে আসবো। কোথায় যাবো সে জায়গাও ঠিক করে আসবো। তুমি নীপা, শম্পাকে নিয়ে তৈরি থেকো। বেলা ১টা বেজে গেলো। কারফিউ আরম্ভ হয়ে গেলো আবার। ঠিক তখনি গাড়ির শব্দ পেলাম। বুঝতে পারলাম, এসেছে। গাড়ি গ্যারেজে রেখে ওপরে উঠে এলো। কিছুক্ষণ পরই শুর" হলো বোমাবর্ষণ। ভারতীয় মিগ তখন পাকিস্তানি ঘাঁটির ওপর অনবরত আক্রমণ চালা'ছিল। আমরা কোনোরকমে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম। বেলা প্রায় সাড়ে ৪ টারদিকে দোতলার সামনের বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে আলীম, মা আর আমি দেখছিলাম পিলখানার ওপরে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। সে বলছিল, এ দেশের পাকিস্তানিরা বোকার স্বর্গে বাস করছে। ভারতীয় বিমানকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাই তাদের নেই। দ্যাখো, ওরা ই'ছামতো বোমা ফেলছে। দেখে মনে হ'ছে যেন এটা তাদের আকাশ। আর এরা বলে কিনা আমেরিকার সপ্তম নৌবহর এসে এদের বাঁচাবে। গতকালও মওলানা বলেছে, ২/১ দিনের মধ্যেই নাকি সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে যাবে। বলেই খুব হাসছিল সে।

ঠিক তার একটু পরেই আমরা একটি গাড়ির শব্দ পেলাম। দাঁড়িয়ে দেখলাম, মাটি লেপা একটি ছোট মাইক্রোবাস এসে আমাদের বাসার নিচের তলায় মওলানার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। এরকম গাড়ি প্রতিদিনই আসতো সময়ে-অসময়ে তার কাছে। কাজেই গাড়ি দেখে আমাদের অন্য কিছু মনে হয়নি। আলীম শুধু বললো, উঁকিঝুঁকি দিয়ো না, ভেতরে যাও। এই বলে সে বাথর"মে গেলো। আমি আর মা ভেতরে চলে এলাম।

প্রায় ৪৫ মিনিট পর আমাদের সিঁড়ির নিচের বাইরের দিকের দরজায় বেল বেজে উঠলো। ওপর থেকে দেখলাম দুজন আলবদর বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে দরজা খুলতে বলছে। আমি আলীমকে জিজ্ঞেস করলাম, খুলবো নাকি। সে বললো, খুলে দাও। বলেই সে নিচের তলায় মওলানার কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। আমি বললাম, কোথায় যাও। বললো, মওলানা সাহেবের কাছে। তিনি তো অসুবিধা হলেই যেতে বলেছেন। আমি বাধা দিইনি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে মওলানার দরজায় প্রাণপণে শব্দ করতে লাগলো আর বললো, মওলানা সাহেব, একটু দরজাটা খুলুন। অনেকবার বলার পরও মওলানা দরজা খুললেন না। শুধু ভেতর থেকে বললেন, আপনি যান, আমি আছি।

আলীম তখন দৌড়ে ওপরে উঠতে যা"ছল কিন' ততোক্ষণে ওরা ঢুকে গেছে ভেতরে। তাকে দেখেই বললো, হ্যান্ডস আপ। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আলীম বললো, কেন? ওরা বললো, দরকার আছে। সে কাপড় বদলে আসতে চাইলে ওরা বললো, অন্য কাপড়ের দরকার নেই। কোথায় যেতে হবে জানতে চাইলেও বললো, তা গেলেই জানতে পারবেন। লুঙ্গি আর শার্ট পরেই আলীম ওদের সঙ্গে চলে গেলো। ওরা দরজার বাইরে যেতেই কাজের ছেলে দুটি ওপরে দৌড়ে এসে বললো, সাহেবকে ওরা ধরে নিয়ে যা"ছ। আমি ছুটে মওলানার কাছে গেলাম যার মুখের দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা হতো সেই আমি তার পায়ে পড়ে গলোম। আকুল হয়ে কেঁদে বললাম, মওলানা

সাহেব, এখনো গাড়িটা ছাড়েনি, আপনি একটু দেখুন। একটু ওদের বলুন। মওলানা চুপ করে বসে রইলেন। গাড়িটা ছাড়ার শব্দ পাওয়া গেলো। তখন তিনি আমাকে বললেন, ঘাবড়াবেন না। ওরা আমার ছাত্র। ওরাই উনাকে নিয়ে যা"ছ। ডাক্তার রাব্বি এবং আরো অনেককেই ওরা নিয়ে যা"ছ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন নিয়ে যা"ছ? তিনি বললেন, চিকিৎসার জন্য। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় নিয়ে গেলো? বললেন, 'সিএমএইচ-এ'।

আমি কিছুটা আশ্বস্ত্ম হয়ে ওপরে উঠে এলাম। এসেই মিসেস রাব্বিকে ফোন করতে চেষ্টা করলাম। অনেক চেষ্টার পর একবার পেলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ বিকাল ৪ টায় নিয়ে গেছে। আর কি ওরা ফিরবে? আমি এ কথা শুনে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আবার নিচে ছুটে এলাম। মওলানাকে বললাম, আপনি আমাকে একটু সঠিক খবর দিন। আমার অস্থিরতা দেখে তিনি বললেন, এতো উতলা হ"ছন কেন? বললাম তো চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেছে। কাজ হয়ে গেলেই দিয়ে যাবে। বললাম, শীতের কাপড়তো নেয়নি। ওগুলো পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিন। তিনি বললেন, সে ব্যবস্থা ওরা করবে। ওপরে উঠে আবার ফোন করতে চেষ্টা করলাম কিন্' তখন আমার ফোনটির আর কোনো শব্দ নেই– ডেড। আমি আরো দিশেহারা হয়ে পড়লাম। আবার গেলাম মওলানার কাছে। বললাম, আমার টেলিফোন ডেড। আপনি একটু হাসপাতালে ফোন কর"ন, আমি আলীমের সঙ্গে কথা বলবো। তিনি বললেন, পাগল হয়েছেন? এখন ওরা ভীষণ ব্যস্ত্ম। এখন ফোন করা যাবে না। ফোনের কাছে এসে ব্যর্থ চেষ্টা করলাম ফোন করতে। রাত বাড়তে থাকলো। কান পেতে রইলাম, দরজার কড়ানাড়া শোনার জন্য। সামান্যতম আওয়াজেও সচকিত হয়ে উঠেছিলাম। বার বার শুধু মনে হ"ছল, এবার সে এসেছে।

কিন্' না, সে আসেনি। সে রাতে নয়, কোনো রাতেই নয়। পথের দিকে চেয়ে চেয়ে রাত ভোর হলো এক সময়। হঠাৎ কানে এলো, জয়বাংলা ধ্বনি। ছাদে ছাদে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে সবাই জয়োলাস করছে। আমার চোখে তখন অন্ধকার। বুকে সর্বনাশের ঘণ্টধ্বনি। আমি পথে নেমে এলাম আমার স্বামীকে খোঁজার জন্য। একটি রাস্ত্মায় দেখতে পেলাম বিজয়োলাস করে মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে আসছে। আমি নির্নিমেষ তাকিয়ে খুঁজলাম একটি মুখ, না সে নেই। দিশেহারা আমি তখন বাসায় এসে কাজের ছেলেদের পাঠালাম আলীমের ছোটভাই হাফিজের কাছে গেণ্ডারিয়ায়। ওরা ফিরে এলো। রাস্ত্মায় এলোপাতাড়ি গুলি চলছে, তাই যেতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধা এলো কয়েকজন, বললো, আলীম ভাইকে যে মেরেছে সে কোথায়? বললাম, জানি না। মওলানা আবদুল মান্নান তখন পালিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও সে আমাদের খাওয়ার ঘরে লুকিয়েছিল, পরে পালিয়ে গেছে।

১৮ ডিসেম্বর রায়ের বাজারের ইটখোলার বধ্যভুমিতে আরো অনেক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে পাওয়া গেলো আলীমের লাশ। গায়ের শার্টটি গায়েই ছিল। হাত দুটো দড়ি দিয়ে পেছনে বাঁধা। চোখ বাঁধার গামছাটা গলায় এসে ঠেকেছে। বুকটা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। তলপেটের ও কপালের বাঁদিকে বেয়নেটের আঘাত। হয়তো আরো ছিল আঘাতের চিহ্ন কিন্' আমি আর দেখতে পারিনি। আজিমপুর নতুন গোরস্থানে তার বাবার পাশেই তাকে সমাহিত করা হলো।

শ্যামলী চৌধুরী : ডা. আলীম চৌধুরীর স্ত্রী।
রশীদ হায়দার সম্পাদিত 'স্মৃতি : ১৯৭১' গ্রন্থ থেকে সংকলিত; ভোরের কাগজে প্রকাশিত।